একটি সমাহিত আগ্নেয়গিরি

জ্যোতির্ময় দত্ত

''ফিরে এসো চাকা'-র ৭৭টি কবিতার রচনাকাল ৮ই মার্চ ১৯৬০ থেকে ২৯ শে জুন ১৯৬২। এর মধ্যে সাতটি কবিতা '৬০' সাল (যার মধ্যে চারটি অক্টোবর মাসে) রচিত। ১৯৬১-র ১৩ই জুন পর্যন্ত নীরবতা। জুন ও জুলাই '৬১' -তে বিনয় মজুমদারের অবরুদ্ধ ঝরণা আবার পাথর সরিয়ে পর - পর এগারোটি অলৌকিক লিরিক উৎক্ষেপ করল। ১৯ শে জুলাই তিনি লিখলেন ''বেশ কিছুকাল হল চলে গেছ প্লাবনের মতো'' এবং ''নেই কোন দৃশ্য নেই, আকাশের সুদুরতা ছাড়া''। ২০ শে জুলাই শেষ হল চারটি কবিতা, —যার যে কোনো একটি লিখতে পারলেই কবিতার ইতিহাসে অমরত্ব নিশ্চিত। প্রথমটি উদ্ধৃত করছি :

আর যদি নাই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী
বাষ্পের সহিত যদি বাতাসের মতো না-ই মেশো,
সেও এক অভিজ্ঞতা; অগণন কুসুমের মতো
তোমার অভাব বুঝি; কে জানো হয়তো অবশেষে
বিগলিত হ'তে পারে; আশ্চর্য দর্শন বহু আছে—
নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতন তোমাকেও
হয়তো পাইনা আমি; পূর্ণিমার তিথিতেও দেখি
অস্ফুট লজ্জায় ম্লান ক্ষীণ চন্দ্রকলা উঠে থাকে,
গ্রহণ হবার ফলে এরূপ দর্শন বহু আছে।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী রচনাকাল, কিংবা রাইনের মারিয় রিলকেঁর ''অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেটমালা লেখার সময়ে, এ রকমই সৃষ্টির ঘূর্ণিঝড় উঠেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ - রিলকেঁর ছিল দীর্ঘ প্রস্তুতি; বিনয় আবির্ভূত হলেন কোনো ভূমিকা বিনা। তাঁর কবিতায় সৃষ্টি - রহস্য বিশ্লেষণের অতীত। তবু কোনো কোনো চাবি হয়তো তাঁর জীবনের ঘটনাবলীতে পাওয়া যাবে। বিনয়ের কবিতায় যে বিচ্ছেদের অনুভূতি আছে তা সার্বিক ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজেই একটি ভূমিকায় এর আত্মজৈবনিক উৎস স্বীকার করেছেন:

''একজন বান্ধবীকেন্দ্রিক এই শুধুমাত্র/ প্রেমার্তির কাব্যখানি যথাযথ দিনপঞ্জী বিশেষ। তবে বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট/ পদ্ধতিতে রচনা করার ফলে কাব্যের/ অন্তর্গত সংখ্যাত প্রতিটি অংশ যে-কোন/ পাঠক কিম্বা পাঠিকার নিজেরই জীবনের/ কোনো পরিস্থিতির বিশ্লিষ্ট রূপায়ন/ বলে মনে হবার কথা। সেই উদ্দেশ্য/ মনে রেখেই প্রতিটি সংখ্যাত অংশ/ রচনা করা হয়েছে।''...

প্রত্যেক শিল্পকর্মই বিশেষ অভিজ্ঞতার কাকতালকে পরিণত করে প্রতীকের সার্বজনীনতায়। বিনয়ের ক্ষেত্রেও কোনো এক বিশেষ নারীর জন্য কামনা পরিণত হয়েছিল সব মানুষের স্পর্শাতীত কোনো অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হবার তৃষ্ণায়। বিনয় আপতিক থেকে প্রতীকে এবং প্রতীক থেকে আপতিকে আনাগোনা করেন :

বাতাস আমার কাছে আবেগের মথিত প্রতীক
জ্যোৎস্না মানে হৃদয়ের দ্যুতি, প্রেম; মেঘ—শরীরের
কামনার বাষ্পপুঞ্জ; মুকুর, আকাশ, সরোবর,
সাগর, কুসুম, তারা, অঙ্গুরীয় — এ সকল তুমি।
তোমাকে সর্বত্র দেখি ; প্রাকৃতিক সকল কিছুই
টীকা ও টিপ্পনী মাত্র, পরিচিত গভীর গ্রন্থের।

আমার ধারণা যে গভীর গ্রন্থের 'টীকা ও টিপ্পনী'' মাত্র '' ফিরে এসো, চাকা''-র কবিতাগুলি, তার একটি অধ্যায় মাত্র হচ্ছে কোনো বিশেষ নারীর প্রতি তাঁর অনুভূতি; অপর অধ্যায়গুলির মধ্যে আছে ঈশ্বরের সঙ্গে, সৃষ্টির সঙ্গে, জননীর সঙ্গে একীভূত হওয়ার আকাঙ্খা। বিনয় মজুমদারের কবিতার মূল বিষয় হচ্ছে সমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির পারক্যবোধ, — যা অতিক্রম করায় একটি উপায় হচ্ছে নারীর প্রতি প্রেম। কিন্তু তাই একমাত্র উপায় নয়, ধর্মীয় সাধক সৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হন এক উপায়ে, শিশু মাতার সঙ্গে যুক্ত থাকে জরায়ুতে; কুচকাওয়াজরত সৈনিককে গোষ্ঠীর সঙ্গে এক করে দেয় ব্যান্ডের তাল। আধুনিক সাহিত্যের মর্মস্থলে আছে এই পারক্যবোধ,— কিন্তু বাংলার কবিতায় বিনয়ের আগে তীব্রভাবে কেউ এটা উপস্থিত করেননি। তার কারণ কি শুধুমাত্র ''প্রেমে বিফলতা''? ''ফিরে এসো, চাকা''-র প্রথম কবিতার শেষ দুই পংক্তি স্মরণ করা যায় :

তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে - দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।

এই মিলনের আকাঙ্খা সার্বিক, এটা কোনো ফুলশয্যার পালঙ্কে তৃপ্ত হবার নয়। যে বিচ্ছেদের অনুভূতিতে :

গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি গূঢ় ভালোবাসার মতন
প্রকাশের কোনরূপ উপায়বিহীন যন্ত্রণায়
গীতিপরায়ণ আমি;

সেই অনুভূতির সূচনা জন্মমূহূর্তে, গর্ভধারিনীর সঙ্গে নাড়ির যোগ ছেদনের মুহূর্তে কখনও পরিহাসছলে কখনো তীব্র ব্যথায় তিনি উল্লেখ করেন ''অসীম শিল্পীর হাতে বৃক্ষ শেষে হতেছে টিপিয়'' অথবা ''দূর থেকে ভেসে

আসে কাঠ চেয়ারের শব্দ”

আমি যেই কেঁদে উঠি অনির্বাণ আঘাতে আহত
তখন সকলে ভাবে, শিশুদের মতোই আমার
ক্ষুধার উদ্রেক হ’লো, বেদনার কথা বোঝে না তো।

মাতা বিনোদিনীর সঙ্গে বিনয়ের নাড়ীর যোগ ছিন্ন হয় ১৯৩৫ সালে, বর্মায়। বাবা বিপিনবিহারী মজুমদার কৈশোর শেষ না-হ’তে চাকরি নিয়ে চলে যান বিদেশে। মাঝে ছুটিতে একবার ফরিদপুরে ফিরে চোদ্দ বছরের বিনোদিনীকে বিয়ে করে একা বর্মা ফিরে যান। দু-বছর পর বিনোদিনীকে স্বামীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য জাহাজে তুলে দেওয়া হল, সঙ্গী শুধু এক জ্ঞাতি ভাই। বিনোদিনী না বোঝেন বর্মার ভাষা, না পান সার্ভেয়ার স্বামীর সাহচর্য। একমাত্র সেই ভাই যে ছয়মাসের মধ্যে বসন্তরোগে মারা যায়। যে পারক্যবোধে বিনয় ডুবে আছে তা কিঞ্চিৎ পরিবারিক। বিনয়ের স্মৃতিতে নিজের বাবার সঙ্গে সবচেয়ে কাছাকাছি হওয়ার যে ছবিটি আছে তা একাধারে অনিরাপত্তার ও ঘনিষ্ঠতার। জাপানিরা বর্মায় পৌঁছলে মজুমদার পরিবার হাঁটাপথে দেশে ফিরেছিলেন : বিনয়ের মনে আছে এক পাহাড়ি ঝরণায় তাঁর বাবা তাকে স্নান করাচ্ছেন। কিন্তু এতটা ঘনিষ্ঠতা বিরল। এরপর থেকে বিনয়ের জীবন হস্টেলে হস্টেলে কেটেছে। নিঃসম্বল অবস্থা থেকে একা একা যুদ্ধ ক’রে আর্থিক নিরাপত্তার বয়া অবশেষে পেয়েছিলেন বিনোদবিহারী। সহজ আবেগকে সন্দেহ ও নিরপেক্ষ টাকার নিরুত্তাপ ক্ষমতাকে সম্মান— এই দুই চালিত করেছে কবির পরিবার। প্রথমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, পরে বর্মার স্বাধীনতা লাভ, দু-দুবার উদ্বাস্তু হয় মজুমদার পরিবার। যতোদিনে ঠাকুরনগরের বাস্তুরচনা করলেন ততোদিনে ছেলেরা সব নিজ নিজ কক্ষে আবর্তিত। তারা কেউ বছরের একসময় বাড়ি ফেরেনা। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা - লেপ - তোষক, বালিশ চাদর, বাসন, কেউ অপরেরটা ব্যবহার করেন না। এই দূরত্বের একটি পরিচয় পেয়েছিলাম আমি ১৯৭০ -এ, মানসিক হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে তাঁর বড়দা ইনকমট্যাক্স অফিসার অনিলবরণ মজুমদারের স্বাক্ষর চাইতে গিয়ে। বিনয় অনুভূতিপ্রবণ ও কোমলচিত্ত বলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিল, মজুমদার পরিবারের অন্যেরা শক্ত। তাঁরা দুরত্বকেই পরিণত করেছেন চারিত্রিক বর্মে। সে-সময় আমি ঘন-ঘন ঠাকুরনগর যেতাম। একমাত্র যে ব্যক্তি আমাকে উষ্ণভাবে গ্রহণ করত সে হল রেণু, ওই পরিবারের আশ্রিতা, যার বাবা একদিন অন্যের প্রণয়াসক্ত স্ত্রীর প্রতি অভিমানবশতঃ একবস্ত্রে পূর্বপাকিস্তান চলে গিয়েছিল। রেণু তার মাকে দেখেনি বহুদিন; যে তার হৃদয়ের সব বাৎসল্য উজাড় করে দিয়েছিল তার পোষা বেড়ালের উপর। আর আমি গেলে সে হেসে কাছে এসে দাঁড়াত। এটা প্রতীকী যে একদিন আমাকে উপহার দেওয়ার জন সারা বাগান ঘুরে বিপিনবাবু সংগ্রহ করে আনলেন একমুঠি সবুজ বড়ো এলাচ সদৃশ লঙ্গা— যা এত ঝাল যে তাঁর মতে এক কড়াই ডালের জন্য একটি লঙ্কার একচতুর্থাংশই যথেষ্ট ‘‘বিনয় সুস্থ হয়ে ফিরে এলে কোথায় তাকে রাখবেন” —এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জমির প্রান্তে একটি টালির চালাঘর দেখিয়ে দিলেন। ওই ঘরটির নাম দিয়েছিলেন ‘শান্তিনিকেতন’ — হওয়া উচিত ছিল ‘দূরত্ব’। অবশ্য প্রকৃতই যখন বিনয় বাড়ি ফিরল, তাকে অতদূরে নির্বাসিত করেননি বিপিনবিহারী।

বাইশে ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে ‘‘ফিরে এসো, চাকা’ -র একটি কবিতায় আমরা বর্তমান কবির একটি পূর্বাভাষ পাই। এই বছর বিনয়ের পঞ্চাশ হল। তিনি একটি আগ্নেয়গিরি যা ক্রম লাভা উদগীরণের দ্বারা নিজের চারিদিকে এক ধাতব দেওয়াল রচনা করেছে। বাইরে থেকে সেই পুরনো আগুন অনুমান করা অসম্ভব। একটা পুরনো কোট গায়ে এই রুশভাষাবিদ গাণিতিক - কবি ঠাকুরনগরের এক পরিচিত দৃশ্য। সকালে লঘু প্রাতঃরাশের পর নির্দিষ্ট কয়েকটি দোকানে উঁকি দিয়ে, খবরের কাগজ সংগ্রহ করে, ডাকঘর হ’য়ে, তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর কয়েকটি কবিতা ইংরেজি অনুবাদে দেশ-দেশান্তরে একদা সাড়া তুলেছিল বটে, এখন বিশেষ কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে না। তিনি মারা গেলে নিশ্চয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ তাঁর কাব্যের গবেষণায় ব্রতী হবেন। তবু যেমন নিভন্ত আগ্নেয়গিরির গায়ে ফোটে বনফুল, অগ্নি - নলের ওপরে ওড়ে প্রজাপতি, তেমনি বিনয়কে ঘিরে আছেন কয়েকজন কিশোর ও তরুণকবি যাঁরা টাকার অভাব ও সমাজ পিতাদের অবহেলা আগ্রাহ্য করে বইমেলা উপলক্ষ্যে এই সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টিতে দূরত্ব যেমন সত্য, প্রাণের প্রতি প্রাণের এই ভালোবাসাও তেমনি সত্য। বিনয় - পরিমন্ডলের যুবকদের উদ্দেশ্য আজ থেকে ২৩ বছর আগে রচিত কবিতাটি উৎসর্গীত হোক:

প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন।
অগ্নি উদ্গমন ক’রে এ-গহ্বর ধীরে ধীরে তার
চারিপাশে বর্তমান পর্বতের প্রাচীর তুলেছে।
এতো উচ্চে সমাসীন আর তার আপন শঠত,
যাতে সমতলবর্তী প্রজাপতি, পাখিদের রঙ
তার কাছে নিরর্থক; এমন সমস্যাকীর্ণ আমি।
দূরে যাও মেঘমালা, তোমাদের দৌত্যে, আলিঙ্গনে
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ক্রোড়ে তো যাবো না;
আমি যাবো দেশান্তরে যেখানে ফুলের মুক্তি আছে।
বৃষ্টি, ঢেউ, ত্যাগ ক’রে রসে পুষ্ট শিল্প পেতে পারি
বর্তমানে চারিপাশে পর্বতের প্রাচীর আসীন।
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবোনা।